দক্ষিণবঙ্গীয় লৌকিক ছড়ার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ইয়াসমীন আরা লেখা

'লোক' শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যক্তি, মানুষ। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা লোক শব্দের অর্থ বুঝি নাগরিক শিক্ষা সংস্কৃতির বাইরে অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে। শিক্ষা নয়, বিশ্বাস আর সংস্কারই যাদের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতি, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, ব্যথা-বিরহ, আনন্দ-উৎসব এসবই শহুরে শিক্ষিত মানুষদের থেকে আলাদা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

অমার্জিত কিন্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাষা, স্বাভাবিক চালচলন, সাদামাটা পোশাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ রান্নাবান্না, খাবারদাবার, আধিদৈবিক বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-উৎসব, রোগমুক্তির প্রত্যাশায় ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, ধর্মানুষ্ঠান, মেলাপার্বণ ইত্যাদি এই লোকসংস্কৃতির মূল অভিব্যক্তি। সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠীর এই কর্মকাণ্ডকেই আমরা লোকসংস্কৃতি তথা লোকঐতিহ্য বলেই মানি। এই লোকঐতিহ্যই ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দেবে বাংলার কৃষক, খেতমজুর শোষণ পীড়নের কাহিনি এবং তাদের মিলিত সংগ্রামে প্রতিরোধের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস।

লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশ লোকসাহিত্যে অতি সমৃদ্ধ। বাংলার মাটি খুব উর্বর; আবহাওয়া কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকসাহিত্য সৃষ্টির যে সব শর্ত আবশ্যক, বাংলাদেশে সেসব বিদ্যমান ছিল। বাংলার মানুষের ভাষা ছিল, ভাষা প্রকাশের আবেগ ও অনুভূতি ছিল। অক্ষরজ্ঞান না থাকায় মানুষ নিজের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারেনি; মুখের কথা লোকমুখে তুলে দিয়েছে। শ্রুতির আর স্মৃতির উপর নির্ভর করে লোকরচনা এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। লোকসাহিত্য এই অর্থেই জনসমষ্টির রচনা। (আহমদ : ১৯৯৪:৭)

লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়েই সমাজের গণমানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাস তথা আশা আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে। কোনো জাতির লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে এই লোকসংস্কৃতি।

লোকসাহিত্য স্মৃতি নির্ভর। ছড়া, ধাঁধা, জারি, সারী ইত্যাদি যে-কোনো গানই গায়ক কোনো পুথি থেকে শেখেনি। শেখেনি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। শিখেছে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বা সমবয়সি বা ছোটোদের নিকটে। আর ওই ব্যক্তি শিখেছে পূর্বতন ব্যক্তির নিকট থেকে। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলেছে লোকসাহিত্য।

নগরসভ্যতার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা লোকসাহিত্য হারিয়ে যাচ্ছে। পল্লিবাসীর প্রাণের কথা এই লোকসাহিত্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতার সব উপাদানই রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটছে এগুলি আমরা কীভাবে গ্রহণ অথবা বর্জন করছি, প্রতিকার বা প্রতিরোধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছি, বাস্তব ও স্বপ্নের বিভোরে

কীভাবে সময় পার করছি, বর্তমান দুঃসময়টা পার করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানিতে আমরা কতটা আশান্বিত—এ সবের উপাদান লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। এখানে হাস্যরসের খোরাক যেমন আছে তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও আছে। মেধা খাটিয়ে বক্তার প্রশ্নের উত্তর শ্রোতাকে দিতে হয়। এতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অংশগ্রহণ থাকে। এখানে বিশেষণের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। লোকসাহিত্য স্পষ্ট করে দিন তারিখের সন্ধান না দিলেও কালের আবর্তে ঘূর্ণায়মান ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দেয় সাহিত্য পদবাচ্য করে, যা থেকে পাঠক এক দিকে যেমন ইতিহাস জানতে পারে তেমনি সাহিত্যরসও গ্রহণ করতে পারে।

ছড়া

কোনো কোনো লোকবিজ্ঞানীর মতে ছড়া হচ্ছে লোকসাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টি। মূলত ধাঁধা বা হেঁয়ালিই প্রাচীন। ধাঁধার সঙ্গে আদিম মানুষের বহু বিশ্বাসের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু ছড়ায় এসব বড়ো একটা নেই। তা ছাড়া ছড়ায় যে সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাকেও আদিমতম সৃষ্টি বলা যেতে পারে না। সংগীত অপেক্ষাকৃত সভ্য মানুষের সৃষ্টি। ছড়াকেও আমরা বরং সংগীতের পূর্ব পর্যায় বলতে পারি। সংগীত গীত হয় কিন্তু ছড়া আবৃত্তি করা হয়। সৌন্দর্য এবং সুর চিরদিনই মানুষের প্রার্থিত। সেজন্যেই ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়ই নয় শুধু অধিকভাবে ব্যবহারও হয়েছে। ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ প্রভৃতির মধ্যে আমরা যে ছন্দ-সৌন্দর্য দেখতে পাই খ্যাতিমান লোকবিজ্ঞানীদের মতে তা ছড়ার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। সেদিক দিয়ে আমাদের ছড়া সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

'ছড়া' শব্দটির দুটি প্রতিষ্ঠিত অর্থ : ১. প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো; ২. গ্রথিত, গাঁথা-মালা-ছড়া। গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত এই ছিল আগের ছড়ার বিশেষত্ব। তারপর এর অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা।

এ ছড়াগুলি কখন কে কবে রচনা করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় না। নানা স্মৃতি কাহিনি বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা কথোপকথনের ভিতর দিয়ে এগুলি জীবিত রয়েছে মানুষের মুখে মুখে। ছড়ার এই সকল কথাই ভাঙাচোরা হাসি-কান্নাতে, অদ্ভুতে মেশানো।

ছড়াগুলির শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন। তবুও কয়েকটি মোটা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(ক) ছেলে ভুলানো ছড়া, (দুই) রসের বা আনন্দের ছড়া, (তিন) বিয়ের ছড়া, (চার) জামাই মস্করার ছড়া, (পাঁচ) বিদ্রুপাত্মক ছড়া, (ছ) খেলার ছড়া, (সাত) অভিমানের ছড়া, (আট) বাউল গান/ছড়া প্রভৃতি।

ছেলে ভুলানো ছড়া (ঘুমপাড়ানি)

ছেলে ভুলানো ছড়া অতি পুরনো এবং শিশু সাহিত্য। শিশুর মানস নদীর তরঙ্গের মতোই নীল আকাশের মতোই স্বতঃ পরিবর্তনশীল। শিশু সম্পর্কীয় ছড়াগুলো যে শিশুকে পড়ানো বা ভোলাবার জন্যেই কোনো এক সময় কোনো মাতৃস্থানীয় নারী কর্তৃক

আবৃত্তিকৃত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত বিচিত্র ঘুমপাড়ানী (Lullaby) ছড়ায় বিশ্বের ছড়ার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এতে শিশুর সুন্দর স্বভাব, ভবিষ্যৎ বীরপনা দেশের ঐতিহ্য, কথায় অবহেলা করলে বিপদ, তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদিই কীর্তিত।

ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে আছে শিশুকে ভয় দেখিয়ে কান্না থামাবার চিত্র। খাজনা আদায়কারী গ্রামীণ সমাজে যে মূর্তমান আতঙ্ক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিশুদের কান্না থামাতে খাজনা আদায়কারীদের নাম উল্লেখ করায়। শিশুদের ভয়ের উপাদান হল—খাজনা আদায়কারী (১) সাপ (১২), বেদে (৮), বন্য প্রাণী (৯, ১০, ১৪), বিড়াল (১১), কাক, মাছরাঙা (১৩) প্রভৃতি।

১। শিশুকে কান্না থামাবার জন্য এই ছড়া বলা হয়।
অলদি পোকখি ডাকছে
ক্যালা ছরা পাকছে
বাশশা বারির প্যাদা আইছে
কতা কোইতে মানা হরছে
চুপ্‌চাপ নিচ্চুম।

২। শিশু হলুদ পাখি দেখে উল্লাসে গেয়ে বলছে—
অলদি পোকখিরে
কাপুর কাইচ্চা দে।
তোর বিয়ার নাচতে যামু
নুপুর কিননা দে

৩। আয় আয় চৈ চে
গিরমি ধানের খৈ।
রাবেয়ারে বিয়া দিমু
জামাই পামু কৈ।
—মা শিশুকে কান্না থামাতে এই ছড়া বলে।

৪। আয় চান লোইররা।
দুত-ভাত খাইয়া
গেদুর লগে টুককুরুত।
—মা শিশুকে নতুন চাঁদ দেখে তার কোলের শিশুকে আঙ্গুল দেখিয়ে এই ছড়া বলে।

৫। শিশুর কান্না থামানোর আরও একটি ছড়া—
আয় তুত দোলে
বোইন্‌না পাতা ঝোলে
মোগো গেদু কোলে।

৬। আয় আয় চৈ চৈ
রাঙ্গা ধানের খৈ।

ডাক্তারেরে মাডি দিমু
কয়বোর দিমু কৈ।

৭। ও দেগু গেদুরে
গেদু কান্দে কিয়ারে।
ইছা মাচ ঝোলের
ইছা মাচ না পাইয়া
গেদু কান্দে দোরাইয়া।

৮। ওলি ওলি বদোনি
ছোডো গেদুর ঘুমানি
আইচে আছে বাইদ্‌দার নাও
গেদুরে লোইয়া চোইল্‌লাও যাও।
—শিশুকে মা বেদের ভয় দেখাচ্ছে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াবার জন্য।

৯। ওলি ওলি ভূত
তোর মায়েরে নেছে
বোন খাডাশে
তুই খাবি ক্যার দূত।

১০। কাইনদো না গেদু
ঘ্যাতরায় ধোইর্‌রা নেবে।
তোমার বাবা শদাগর
হার বানাইয়া দেবে।

১১। কালা বাইগুন ধলা বাইগুন-বাইগুন রে
নোন্দের এউক্‌কা পোলা অইছে আতুর রে।
ওলা বিলোইর ঝোলা অইছে ক্যাতোর রে।
ব্যাঙ্গে ধোইর্‌রা থাবা দেছে গেদুরে।

১২। গাছে বাইগুন ঝোলে
টক বাইগুন তোলে।
হাপের মোহে আগুা
মোগো গেদু ঠাণ্ডা।

১৩। গেদু গেদু করে মায়
গেদু গ্যাছে সাধের নায়
হাতটা কাউয়ায় দার বায়
মাইচছা রাঙ্গায় বোইডা বায়।
গেদুরে তুই শিগগির কোইররা বারতে আয়।
—ছোটো শিশু মার কাছ থেকে দুরে গেলে মা এই ছড়া কেটে শিশুকে ডেকে তাড়াতাড়ি ঘরে আসার আবেদন জানায়।

১৪। গেদু নাচে দুয়ারে
ধান খাইয়া যায় হুয়ারে।
ও হুয়ারডা ফির্‌রা চা
গেদুর নাচন দেইক্‌খা যা।

১৫। ঘুঘু চোই ঘুঘু চৈই,
গেললি কোই?
মামু বারি।
খাইছো কি?
আইট্টা ক্যালা।
দ্যাক্‌ছে কেডা।
আছান মোল্লা
শাকখি কেডা?
নৈয়া চোরা।
বরো তাল গাচটা লরে চরে
ছোডো তালগাচটা ভাইঙ্গা পরে।

রসের/আনন্দের ছড়া

রসের ও আনন্দের ছড়ার মধ্যে আছে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত ছবি। আনন্দ প্রকাশের ও রসিকতার উপাদান পাই আর্থিক উন্নতি (১৬), আম খাওয়া (১৭, ২০), বিয়ে (১৮), দাদা (১৯, ২০), বউ (২১, ৩৭, ৪১,৪৪,৪৮), মিস্ত্রী (২২), অতিথি (২৩, ২৭). বালক (২৬), ধান ভানা (২৮, ২৯, ৫৬), কলিকালের ছেলে-মেয়ে (৩২), গাব খাওয়া (৩৩), নাচ (৩৪), ভাই বোনের শাশুড়ি (৩৫), মামা (৩৬, ৫০, ৫৭, ৫৮) স্বামী (৩৯, ৫৩), ভাবী (৪০), মিয়া ছাহেব (৪২), গরু (৪৩), সখী (৪৬), কলা খাওয়া (৪৫), ছাগল চুরি (৪৭), ভাশুর (৪৮), পিতা (৫১), বোনের শ্বশুরবাড়ি (৫২), মা (৫৪, ৫৯), নানি (৫৫) প্রভৃতিতে।

১৬। কখনো কখনো গ্রামের লোকেরা খুশির ঝরনা ছুটাতে গিয়ে নিজেদের ব্যবহার করে থাকে—

আরোম বিবির খারোম পায়
লাল বিবির গালে আত।
পোয়া বিয়ায় চৌদ্দ আত।
পোয়ার আতে গুল্লি বাশ
পোক্‌খি মারে ঠাশ্‌ ঠাশ্‌
হেই পোক্‌খির আলে
দুন্‌নোইদারি জলে।

১৭। আউগ্‌গা গাছের আউগ্‌গা আম
এ্যাকা এ্যাকা খাইছি
জোয়াইল্লা গাছের ব্যাহা আম
তোমার লোইগ্‌গা থুইছি।
এ্যাহোন ভাইব্‌বা দ্যাহো
ক্যামোন ভালো পাইছি

১৮। আচ্ছালামু আলাইকোম পাক্‌কা দারি
আপনাগো বারি কি থাকতে পারি।
লোডাইগ্‌গা দ্যান উজু করি।
মাইয়াগ্‌গা দ্যান শরা পরি
লাডিহ্যান দ্যান পিডাইয়া মারি।

১৯। আমতলি কাডালতলি ধুতি টাঙ্গাইছে
ভালো মানুষের মাইয়া আইন্‌না চিরা কোডাইছে।
সেই চিরা খাইয়া দাদায় আটখোলা গ্যাছে।
আটখোলা আইছে দারোগা বাবা পিডান মারিছে।
সেই পিডান খাইয়া দাদায় গাছে উডিছে।
গাছে আছিলো কাউয়া পাখি ঠোহোর মারিছে।
সেই ঠোহোর খাইয়া দাদায় তলায় পরিছে।
তলায় আছিলো ভাউয়া ব্যাং কামোর মারিছে।
সেই কামোর খাইয়া দাদায় ওশ্‌শায় উডিছে
ওশ্‌শায় আছিলো নাতি-পুতি লাথি মারিছে।
সেই লাথি খাইয়া দাদায় ঘরে উডিছে
ঘরে আছিলো কিলা-কিলি কিল মারিছে।
সেই কিল খাইয়া দাদায় আইতনায় নামিছে।
আইতনায় আছিলো লাথা-লাথি লাথি মারিছে।
সেই লাথি খাইয়া দাদায় স্বর্গে উডিছে।
স্বর্গে আছিলো চাপা-চাপি চাপ মারিছে।
সেই চাপ খাইয়া দাদায় মোইর্‌রা গ্যাছে।

২০। আম গাছে কে?
আমরা দুইজনে
শাক্‌খো দাদায় কোইয়া গ্যাছে
ড্যাবরা বাজাইতে।
ড্যাবরা করছো কি?
বেইচ্চা হালাইছি।
পয়শা হরছো কি?

পান কিয়াছি।
পান হরছো কি?
খাইয়া হালাইছি
চিবড়ি হরছো কি?
চোহিদার বাড়ির ডোবায় হালাইছি।

২১। আমরা গাছে দামরা নাচে
বকুল গাছে কাউয়া নাচে
আটখোলার বোউ কাপুর কাচে।

২২। আমরা দুই ভাই ম্যাস্তরি
আতুর বাডোইলের কাচ করি।
ভাত না পাইলে ফোচ করি।
মক্কা যাইয়া অচ করি
বারতে আইয়া নচ পরি।

২৩। আমরা যাই কেরায় নাইতে
মাগিরা রোইছে বোইয়া
দে মাগিগো ভাঙ্গা নাও
মাগিরা যাউক বাইয়া
আমরা পিন্দি ভালো শারি
মাগিরা রোইচে চাইয়া।
দে মাগিগো ত্যানাতোনা
যাউক মাগিরা লোইয়া

২৪। উইর্‌রা যায় খোনজোন পাখি
পায় দেছে নেহুর।
মশোইর মুরা দিয়া আয়
হিকদার বারির কুহুর।

২৫। উত্তার ধারে গোরু মরছে
হগুন আইছ খাইতে
বারো মাইশ্‌শা মাইয়া চায়
দুলার লগে যাইতে।

২৬। ঐ ছ্যামরাডারে ধর
চুঙ্গার মোইদ্ধে ভর।
চুঙ্গা যেন লরে না
ছ্যামরা যেন মরে না।

২৭। ওতিত আইছে নারাইন্‌না
চাউল নাই কারাইন্‌না

চাউল রোইছে ঠিল্লায়
তোরে ধোইররা কিলায়।

২৮। তারার মায় বারা বানে
তারা চাবায় খুত।
পাচ দুয়ারে অরিং নাচে
তারা আমার পুত।

২৯। ওপার গ্যাল্‌লাম পান খাইতে
পানে দেছে কোপ্পুর
দুই মাগি বারা বানে
ধাপ্পুর ধুপ্পুর।

৩০। ও পারে যাবা না
ভাড়া মাচ খাবা না
শয়তানে ধোকা দেলে
মানসেরে কবা না।

৩১। ওরে বগা
ক্যামোন অইছে তোর বাহের আগা।
আগে আগজে ক্যালাতলা
এ্যাহোন আগে উগোইর তলা।
একটু আরোগ্‌গা অইছে।

৩২। কোলি কাইল্লা গুরা গারা
আইচারে কয় বাসুন খোরা
বিলোইরে কয় আত্তা ঘোরা
কুত্তারে কয় দৌরাইন্না ঘোরা।

৩৩। গাব খামু না খামু কি?
গাবের তুল্‌লো মজা কি?
আর গাব খামু না
মোনে ব্যতা পামু না।

৩৪। নাচতে জানি নাচি না
কোমর ব্যতায় বানি না।
ভাই দেছে আই
কোমোর ব্যতা নাই।

৩৫। পুবের কান্দার মাওইজি
কাপুর পেন্দে ছয় আতি।
টানে টোনে বলে না
পালকি ছাড়া চলে না

পালকি নিমু কোম্‌মেইদ্দা
ফোকু মিয়ার ঘাইট্‌দা
ফোকু মিয়ার নাম কী?
বরিশালের খান কি।

৩৬। প্যাড ব্যতা খুদের নারি
ঝারতে গ্যাল্লাম মামুগো বারি।
মামু দেছে আই
প্যাড ব্যতা নাই।

৩৭। বরো বোউ বরো মানশের ঝি
হ্যারে বা কোমু কি।
মাইজ্জা বোউ ঠুট্টা খ্যাতি
পেরতেক কতায় ঝিক্কা উডি।
ছোডো বোউ মোহে পান
ব্যাবাক লোকের পরান হান।

এই ছড়ায় শাশুড়ির সমস্যার কথা বলা হয়েছে। তিন বউ থাকতে শাশুড়িকেই সংসারের কাজ করতে হয়। কেননা বড়ো বউ বড়ো লোকের মেয়ে, মেজো বই প্রত্যেক কথারই জবাব দেয়, ছোটো বউ সবার প্রিয়। এজন্য কাউকেই কাজ করতে বলতে পারে না। শাশুড়িকে নিজেকেই কাজ করতে হয়।

৩৮। বারো আত বল্লা
ত্যারো আত শিং।
উরে যায় বল্লা
তা ধিং তা ধিং।

৩৯। বারোই বারোই হুতা কাট
কাইল বিহানে গোদার আট
গোদা গ্যাছে আডে
হগলে আনছে রুই কাতলা
গোদা আনছে ইছা
দুই হতিনে যুক্তি হরে
গোদারে মারে পিছা।

৪০। বাশ কাডে বাশুরা
বাশের মোইদ্ধ্যে খুন্‌জুরা।
উত্তার ঘরের ভাউজেরা
ঠিল্লা লোইয়া নামে না।

৪১। মট্‌কা চিংগোইর ক্যালার মৌ
রানতে জানে মেরধার বউ

মেরধা বলে ওশপ কি।
হাইচা হাগে বাহার দি।

৪২। মেয়াচাবে গ্যাছে আডে
বাইজ্জা পরছে ফাডে।
ছোডো ভাই লাইট্টা
দাহান লোইয়া যাইবে আইট্টা
ফাট দেবে কাইট্টা
মেয়াছাবে আইবে উইট্টা।

৪৩। মুনশি গোরু কিনছি
আকাব্বার গোরু ডাক কর।
ল্যাদা গোরু খ্যাদা
ছুমিদ্দা গোরু নিকি কুম্মিদ্দা।

৪৪। মোল্লা বারি তল্লা বাশ
মোল্লার বোউ কাশে ঠাশ ঠাশ
মোল্লায় কয় অকি
হাইচা হাগে বাহার দি
নাইয়া দুইয়া খাবা কি।

৪৫। হালা বোলাইয়া ক্যালা খাও
বাপ বোলাইয়া ডাঙ্গোর অও।
ক্যালা নেছে কামারে
বাপ বোলাবি আমারে।
ক্যালা গ্যাছে পোইচ্চা
বাপ বোলাবি কোইশ্‌শা।

৪৬। ও হোই
কিদ্দার রানছো বোই?
ওগোল বোনে জাবরা দিয়া
পাইল্লাম এ্যাকটা কোই।
তোমার হোইয়ায় খাইয়া গ্যাছে
আলু আলু বোই।
আমি এ্যাহোন খাইতে যামু
তুমি যাবা কোই?

৪৭। কারণে কারণ খাইছে
কারণ খাবা কিদ্দা?
হেই কারণে এই কারণ
কারণ ছাইররা দিগ্‌গা।

বাপ ছাগল চুরি করে বেঁধে রেখেছে। ছাগলের মালিক বাপকে ধরে আটকে রেখেছে। এদিকে ছাগল মশলা খেয়ে ফেলেছে। ছেলে বাপকে খুঁজতে গিয়ে দেখে যে বাপ আটক আছে। ছেলে বাপকে জানায় ছাগলের মশলা খাওয়ার খবর। ছেলে বাপের কাছে জানতে চায় এখন কী দিয়ে ছাগল খাবে। তখন বাপ জানায়, ছাগল চুরির কারণে তার এই আট অবস্থা। সে ছেলেকে ছাগল ছেড়ে দিতে বলে। 'কারণ' শব্দের বিচিত্র ব্যবহার এই ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে।

৪৮। বোউ লো বোউ হিরা
পাট টাহাইন্দা শারি দেলাম
ক্যামনে গ্যালো চিররা?
পাচ দুয়ারে বররা বাশ
ঘোনো ঘোনো গিরা।
ভাশশেরে দেইক্‌খা লাপ দেলাম
শারি গ্যাছে চিররা।

৪৯। পুডি মাছের কুডকুডি
বোয়াল মাছের দারি।
হোবরি গাছে উইট্টা দেহি
বরো মামুগো বারি।

৫০। বরো মামুজি বরো মামুজি বারতে আছো নি?
ওলা বিলোইর ঝোলা অইছে ঝারতে জানো নি?
ঝারতে জানি অণ্ডোকোষ
ত্যাল লাগে তিন কোষ।

—ভাগিনায় জানতে চায় মামা বাড়ি আছে কি না। কেননা তাদের বিড়ালটির অসুখ হয়েছে। মামা বিড়ালটির চিকিৎসা করতে পারবে কিনা? মামা বলে, সে রোগ আরোগ্য করতে পারবে, তবে তিন অঞ্জলি তেল লাগবে।

৫১। বাপ গ্যাছে উত্তারে
বাপ বোলাবি কুত্তারে
বাপ গ্যাছে মোইররা
তোরে নেবে ধোইররা।

৫২। বুগো বাড়ি গেছিলাম।
চিতোই পিডা খাইছিলাম।
ভাজা মাছের প্যাডাডু
কোলমি হাগের ডাডাডু।

৫৩। ছি ছি ছি!
ভদদোর লোকের ঝি
দেতে আইয়া দেলা না

এডা হরলা কি?
দি দি দি
পোথে ঘাড়ে দি
তুমি আমার আমি তোমার
তোমায় দিমু কী?

৫৪। বোকার ইসিতিরি বুদ্ধিমানের মা
আড়ে যামু আনমু কী বল্‌লা না?
নলেরও নলটুনি
আহাশেরও তারা
আতে যোদি থাহে কোরি
গোডা পাচ ছয়
দারি ধোইররা নিয়া আইশশো
কুরি পাচ ছয়।

৫৫। আনোর মোনোর দুই বুইন
পোথে পাইছে মরা গুইল
আনোর বলে খাইয়া যাই
মনোর বলে লোইয়া যাই
তোর নানিরে দিয়া যাই।

৫৬। কোইতুরি কোইতুরি বারা বান
বানছি সাদু ওদা ধান
খুত খাইলে খোরা আন
খোরা নেছে হিয়ালে
কান কাডমু তোর বিয়ালে।

৫৭। তাই তাই তাই
মামু বারি যাই।
মামু দেছে মুইট্টা পিডা
দুয়ারে বোইয়া খাই।
মামি আইছে লাডি লোইয়া
পরান লোইয়া যাই।

৫৮। বাদুর বাদুর চোইতা
মামু কোইছে খাইতা
তিলের শিননি খাইতা
তিল লাগে তিতা
তুমি আমার মিতা

৫৯। মাগো মা বরোই খাইতে গেছিলাম
ফাডের মোইদ্ধে পোরছিলাম
কাডায় লোইলো শুলানি
বুইররা লোইলো দৌরানি
বুইররা গ্যাছে আডে
গাই বিয়াইছে মাডে।
নৌকা দিগির পারে
ঘোরার ঘাশ কাডে।
শুনদোরিরে দেইক্‌খা কেবল
হাপুর হুপুর নাচে।

গ্রামীণ সমাজের মানুষের মাঝে আনন্দ ছিল। সবকিছুতেই তারা আনন্দ পেত। কারও ছেলে যোগ্য হয়ে অর্থ উপার্জন করলে তাদের আনন্দ (১৬), নিজে আম খেয়ে ও বন্ধুর জন্য রাখতে পেরে আনন্দ (১৭), বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে আনন্দ (১৮), দাদাকে নিয়ে আনন্দ (১৯) বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পান খেয়ে আনন্দ (২০), কাকেব নাচ ও নতুন বউয়ের কাপড় ধোয়া দেখে আনন্দ (২১) দুই ভাই মিস্ত্রীগিরি করে হজ করতে পেরে আনন্দ। (২২), নতুন মহিলা অতিথি যারা বেয়াইন শ্রেণী তাদের সঙ্গে রসিকতা করে আনন্দ, নৌকায় বেড়াতে পেরে আনন্দ (২৩), কিশোরীদের বিয়ে নিয়ে আনন্দ, (২৫), মেহেমানদারি করে আনন্দ। হিন্দু বিশ্বাস মতে মেহমানকে নারায়ণের তুল্য মনে করা হয় (২৭), গ্রামীণ বাংলাদেশে ঢেকির চিত্র আছে। গরিব নারীরা অর্থের অভাবে অন্য বাড়িতে ধান ভানত। অনাহারে থাকা শিশু মায়ের ধান ভানার সময় খুদ খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করত (২৮), স্বামী বাজার থেকে রুই-কাতলা না কিনে চিংড়ি মাছ কেনায় দুই সতীনে স্বামীকে নিয়ে আনন্দ (৩৯), পল্লি বধূদের কলস কাঁখে নিয়ে পানি আনতে যাওয়ায় আনন্দ, (৪০), গ্রামের লোক নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছড়া বলাতে আনন্দ (৪৩), শাশুড়ি বউকে শাড়ি কিনে দিয়েছে, সেই শাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণ শাশুড়ি জানতে চাওয়ায় বউ শাশুড়িতে ছড়ার মাধ্যমে জবাব দেয় (৪৮), বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বোনের আদর যত্নে আনন্দ (৫২) বিদেশ ফেরৎ স্বামীকে ছালাম না দেওয়ায় স্বামীর প্রশ্নের জবাবে স্ত্রীর ছড়া কেটে আনন্দ (৫৩), ছেলে ভাবে বাপ বোকা আর নিজে বুদ্ধিমান। তাই মাকে মা সম্বোধন করে মাকে বুদ্ধিমানের মা ও বোকার স্ত্রী সম্বোধন করে আনন্দ (৫৪), মামা বাড়ি মামী নয় মামাই আপন, তার প্রমাণ মামা পিঠা খেতে দিয়েছে, মামি লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধুদের কাছে এই ঘটনা বলতে গিয়ে আনন্দ (৫৭), মা ছেলের কাছে বাড়িতে দেরি করে ফেরার কারণ জানতে চাওয়ায় নানা অজুহাত তুলে ধরে। অন্যের বাড়ির গাছে বরই খেতে যাওয়ায় বুড়ার তাড়া খেয়ে আহত হওয়া, বুড়ার হাটে যাওয়ার দৃশ্য, গাভী প্রসব করার দৃশ্য, ঘাটে নৌকা বাঁধার দৃশ্য, ঘোড়া ও সুন্দরীকে দেখতে গিয়ে দেরি প্রভৃতি অজুহাত দাঁড় করিয়ে রক্ষা পাওয়ায় আনন্দ (৫৯)। সর্বত্রই অনাবিল আনন্দ।

বিয়ের ছড়া

বিয়ের ছড়ায় আছে পল্লি বিয়ের সামগ্রিক চিত্র। পণ প্রথা, নৌকা, কাজল (৬০), শালিকের আগমন, ঢোল বাজানো (৬১), পালকি (৬৩), বানারশি শাড়ি (৬৪), বিয়ের বয়স (৬৫), স্বামীর বাড়ি ও গহনা (৬৬), নাইওর নেওয়া (৬৭), বিয়ে পড়ানো (৬৮), নাচ (৬৯), বরের সঙ্গের মেহমান (৭০), কদু বিক্রি করে সুন্দর বউ ঘরে আনা (৭১) ও সুন্দর বউয়ের কৃত্রিম আচরণ (৭২) প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এইসব ছড়ায়।

৬০। আগের নাইতে ঝামুর ঝুমু
শরবানুরে নেতে আইছে
আইজগো মাইয়া দিমুনা
মাইয়া দিমু হাজাইয়া
টাহার উপর বল্লা

৬১। আবির মায় ছাবি বায়
এ্যাকটা দুইডা ধুরি পায়।
টাইল্লা টুইল্লা টোরহে লয়।
খাইতে খাইতে মক্কা যায়।
মক্‌কা গোনে নল যায়।
নলের আগায় টিয়া
সোনা মেয়ার বিয়া।
সোনা মেয়ার হালিরা আইছে
প্যাচের আংডি দিয়া।
দুই মাতারি ঢোল বাজায়
কোলমি ডাডা দিয়া।

৬২। বরো আপার বিয়া
কচকো সাবান দিয়া
কচকো সাবান হলো না
বরো আপার বিয়া হলো না।
পিছের নাইতে বিয়া
কাজোল ফোডা দিয়া
কাইলগো মাইয়া দিমু
টাহা লোমু বাজাইয়া।
ধোরমু জামাইর কল্লা।

৬৩। আম পরে টাপুর টুপুর
কাডাল পাহে রোইয়া।
ছোডো বাইরে বিয়া হরামু
পালকীতে চরাইয়া।

৬৪। আম্বি টাম্বি তালেরআশ
আম্বির বিয়া ভাদদোর মাশ
আম্বির মোনে বরো খুশি
শারি আনছে বানারশি।

৬৫। ওরে আমার অদেশটো
দাতে দেরাম মেজেষটো।
দাত অইছে পোকতো
বিয়া বওয়ার ওকতো

৬৬। কুড়ি কুড়ি ময়না
ভাত দেলে খায়না।
বাহে দেছে গয়না
হাত ভাই দেছে ঢোলে বারি
চলো না ময়না পরের বাড়ি
পরেরা দেছে গয়না
ঘুইররা ঘুইররা নাচনা।

৬৭। খার ঝি রানছো কি?
ইছা মাছের ঝোল।
খায়রা আইছে নাইওর নেতে
তিনডা আনছে ঢোল।
একটা আনছে হানাইয়া
দুইডা আনাছে বানাইয়া।

৬৮। চিকিক্কা পানি লিকলিক্কা জোক
মোরা মেরধা বারির লোক।
আইছি মোরা খুচোইনে
বোইছি মোরা বিছানে।
আছ্ছালামু আলাইকুম পাক্কা দারি।
আপনাগো বারি কি থাকতে পারি।
ঘাড্ডি দ্যান উজু করি।
ছালাডা দ্যান নামাজ পরি।
মাইয়াডা দ্যান শরা পরি
মাইয়া হরে মোরা মুরি।

৬৯। তোরা নাচতে কোইলাম নাচলি না
তোরা বুঝি নাচোন জানো না।
আমাগো দ্যাশে নেয়ামু
মোগলাই নাচোন হিয়ামু।

৭০। আচ্ছালামু আলাইকুম মিয়া
বর আইছে শোশুর বারি
তোমরা আইছো কিয়া?
ওয়াচ্চালামু আলাইকুম আতে
বর আইছে বিয়া হরতে
আমরা আইছি সাতে।

৭১। আল্লায় যদি বাচায়
কোদু থুমু মাচায়।
হেই কোদু বেইচ্চা।
বোউ আনমু বাইচ্চা
বোউর নাম জগোনি
ক্যাবোল ক্যাবোল চাহনি।

৭২। ইজাল গাছের বিজাল ফুল
চাইলতা গাছে মোউ।
মেরধা বারি দেইক্কা আইছি
শুন্দার শুন্দার বোউ।
বোউরে যদি কামে কয়
ঝামডা মাইররা ঘরে যায়।
পুশশে যোদি বারতে আয়
কান কতাড়ু কোইয়া দ্যায়।

বিয়ের ছড়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণ তথা বরিশাল অঞ্চলের বিয়ের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। কন্যাকে তুলে নেওয়ার জন্য বরের সঙ্গে যে লোকজন আসে তাকে বলে 'পয়শাবার। এই পয়শাবার বা বরযাত্রী কন্যার বাড়িতে পৌঁছাবার সময় রাস্তার উপর কন্যাপক্ষ উপহারের প্রত্যাশায় গেট ধরে আটকানোর ব্যবস্থা করে। তাকে বলে 'গেট ধরা' বা দেউলি'। এখানে টাকা না দিলে কন্যা-বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এখানে দেখা যায় শরবানুকে নিতে এসেছে তাকে সাজিয়ে দিবে কিন্তু বেশি টাকা চাই। টাকা না হলে জামাইকে অপমান করতেও দ্বিধা নেই। (৬০), সোনা মিয়ার শালিরা আসার পর মহিলাদের ঢোল বাজানো (৬১), বোনের ইচ্ছা তার ছোট ভাইকে পালকিতে চড়িয়ে বিয়ে করাবে। কিন্তু ভাইয়ের বিয়ের বয়স হলেও এখনই বিয়ে করাতে পারবে না, কেন না কাঁঠাল পাকেনি। আম তাড়াতাড়ি পাকলেও কাঁঠাল পাকে দেরিতে। পালকির ব্যবস্থা করতে আম বিক্রির টাকায় হবে না, তাই কাঁঠাল পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 'কাডাল পাহে রোইয়া'—এই বাক্যে এক দিকে আমের টাকায় ভাইয়ের বিয়ের খরচ হবে না ভেবে বোনের আক্ষেপ, অন্য দিকে ভাইকে বোঝানো হয়েছে যে ভালো কিছু করতে ধৈর্য দরকার (৬৩), বিয়েতে বেনারসি শাড়ির ব্যবহার (৬৪), নাইওর নিতে ঢোল সহকারে যাত্রা (৬৭), বিয়েতে নাচ (৬৯), লাই বিক্রির টাকায় ভালো বই আনা (৭১)

, বউরা কাজ করে না অথচ স্বামী বাড়ি এলে কান কথা বলে স্বামীকে বিভ্রান্ত করে (৭২) নানাবিধ সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র বিয়ের ছড়ায় পাওয়া যায়।

জামাই মস্করার ছড়া

এসব ছড়ায় জামাইকে নিয়ে বিভিন্ন মস্করার চিত্র পাওয়া যায়। ছোটোবোনের জামাই যাওয়া (৭৩, ৭৫), জামাইর বাপের তামাক খাওয়া (৭৪), নাতি জামাই আসা (৭৬) জামাই দ্বারা ছাতা আনয়ন (৭৭), স্ত্রীসহ জামাইর আগমন (৭৮), ননদের জামাইর শরবত খাওয়ার উপকরণ (৭৯) প্রভৃতি সরস উপাদান পাওয়া যায় এইসব ছড়ায়।

৭৩। আদগান কোই মাচ তালগাচ বায়
সোনার কাইতোর উইররা যায়।
দ্যাকলো মাগি ক্যারা যায়
ছোট্টো বোনের জামাই যায়।
আশশিয়ালা চাদোইর গায়
আশতে আশতে পরান যায়।

৭৪। উত্তারেতে মোইশ মরছে
দুলায় গ্যাছে দ্যাকতে।
দুলার বাহে তামাক খায়
রাজ-বারি ধুয়া যায়।
দুইডা ঘুঘু পাইতাম
দুলার জন্য রাখতাম।

৭৫। জামাই আইছে ঘামাইয়া
ছাতি ধরো নোয়াইয়া
ছাতির উপরে বল্লা
ধরো জামাইর কল্লা।

৭৬। ঝিঙ্গার ফুল ফোডছে
নাতি জামাই আইছে।
ফিরি দি বয় না
পান দি খায় না
পিছা মারি যায় না।

৭৭। হাগে ভাতে রান্ধে
ক্যালা গাছে টাঙ্গে।
ক্যালা অইলো বাতি
বুরির মাতায় ছাতি
ছাতি নিল উরাইয়া
বুরি কানছে দোরাইয়া।

ও বুরি কাইন্দো না কাইন্দো না
ঘরে আইছে জামাই
তারে দিয়া আনাই।

৭৮। আইছো জামাই খাইছো কি?
পিছনে তোমার মায় না ঝি?
আইছি শোশুর খাইছি খাশি
পিছনে আমার মাও না ঝিও না
হারা জীবনের দাশি।

'আশশি আলা চাদোইর গায়' দিয়ে ছোটবোনের জামাই যাওয়া (৭৩), 'দুলার বাহে তামাক খায়, রাজ-বারি, ধুয়া যায়' (৭৪), নাতি জামাইকে 'পিছা মারা' (৭৬), শরবত খেতে 'বরো ভাবির হাত' লাগা (৭৮) প্রভৃতি জামাই মস্করার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে আদর যত্নের বাস্তব উদাহরণও আছে এই সব ছড়ায়। একদিকে— 'দুইডা ঘুঘু পাইতাম, দুলার জন্য রাখতাম' শাশুড়ির এই উৎকণ্ঠা বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্র। এখনও বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামে জামাই এলে জামাইকে কী খাওয়ানো যায় শ্বশুর বাড়িতে সে নিয়ে উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না (৭৪)। অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর কাছে 'হারা জীবনের দাশি' (৭৮) হয়েই আছে আবহমান বাংলায়। এ থেকে নারী সমাজ মুক্তি পাবে কি?

এভাবে অনেক ছড়া ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের আনাচেকানাচে। এখানে তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ছড়ার মাধ্যমে সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এতে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি জীবনধারার প্রতিচ্ছবিই। এর সঙ্গে মিশে আছে পূর্বপুরুষের স্মৃতি।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

স্বরধ্বনি

১। ই, উ যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ হয় 'ও'। যেমন—অতি >[ওতি], মধু >[মোধু]। অন্য ক্ষেত্রে আকারের ওকার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—মন>[মোন], বন>[বোন]। কিন্তু অকারের এই ওকার প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ করা যায় না। যেমন 'দল'-এর উচ্চারণ [দোল] হয় না।

২। শব্দ মধ্যে অবস্থিত 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। ছড়ায় এই অপিনিহিতির ফলে সরে-আসা স্বরধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন—আজি>আইজ (আ+জ্+ই > আ+ই+জ), করিয়া >কোইররা ইত্যাদি। এছাড়া য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে একটি ইকারের আগম হয়। যেমন—বাক্য>বাইক্‌কো।

৩। ব্যঞ্জন সংযুক্ত আদি অ ও মধ্য অ কখনো কখনো ও রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন—আদিতে কমলা>কোমলা, জন>জোন, কইল>কোইলো; পাগল>পাগোল, ছাগল>ছাগোল, যখন>যহোন ইত্যাদি।

৪। উচ্চ মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' ছড়ায় নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—তেল>ত্যাল, বেল>ব্যাল।

৫। ছড়ার ভাষায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অ, আ, ই, উ, স্বরধ্বনিগুলি কখনো কখনো শ্বাসাঘাত (́) প্রধান হয়ে উচ্চারিত হয়। এ ধ্বনিগুলি উচ্চারণে 'হ' উচ্চারিত হয় না 'স্বরধ্বনি' উচ্চারিত হয়। যেমন—হাত > আত, এখানে হাত ও আত এর মধ্যবর্তী উচ্চারণ হয়।

৬। চলিত বাংলার স্বরধ্বনির নাসিক্যতা উপভাষায় বজায় নেই। যথা—চাঁদ>চাদ, পাঁচ > পাচ।

৭। বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জন সংযুক্ত আদি 'অ' ছড়ায় 'ও' উচ্চারিত হয়। যেমন—করিয়া>হোইর্‌রা, ধরিয়া>ধোইর্‌রা, লইব>লোইবো, ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনি

১। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির (ঙ, ন, ম ইত্যাদির) লোপ হয় না, ফলে এইরকম লোপের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবনের প্রক্রিয়া বরিশালের উপভাষায় দেখা যায় না। যেমন—চন্দ্র>চান। এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন' রক্ষিত আছে।

২। 'স' ও 'শ' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন শাক>হাগ, সে>সাত>হাত।

৩। ক্রিয়াপদে 'স' উচ্চারিত হয় না। যেমন—বসো >বও; আস>আও; আসিব>আইব।

৪। 'স' ত-বর্গ যুক্ত শব্দে ও আরবি 'সিন' এবং ইংরেজি 'সি' এর প্রতিবর্ণীকরণে ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র হয় না।

৫। শব্দের আদিতে ও মধ্যে 'হ' স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন—হয়>অ'য়।

৬। তাড়িত ধ্বনি 'ড়' ও 'ঢ়' কম্পিতধ্বনি 'র'—রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—তাড়াতাড়ি > তারাতারি, বড় > বরো, বাড়ি > বারি, আষাঢ় > আশার ইত্যাদি।

৭। 'ল' কোথাও কোথাও 'ন'—রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—লবণ>নুন।

৮। শব্দের অন্তে মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। সেখানে মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ) উচ্চারিত হয়। যেমন—দুধ>দুদ, মাছ>মাচ।

৯। কখনও পদমধ্যস্থিত 'ট', 'ঠ'>'ড' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—এটা>এডা, ছোটটি>ছোডোডি, মিঠা>মিডা ইত্যাদি।

১০। চলিত শিষ্ট বাংলার 'ক' স্থানে 'গ' হয়। যেমন—শাক > হাগ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে—দের বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—কর্মকারক—আমাদের বই দাও। করণ কারক—তোমাদের দিয়া একাম অবে না।

২। বরিশালের উপভাষায় গৌণ কর্মে ও সম্প্রদান কারকে—'রে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—আমারে দ্যাও। তোমারে দিমু না।

৩। অধিকরণ—কারকের বিভক্তি হল 'তে'। যেমন—বাড়তে থাকম (বাড়িতে থাকব)।

৪। কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহু বচনের বিভক্তি হল ' গো'। যেমন—আমাগো খাইতে দেবা না?

৫। সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল 'লাম'। যেমন—আমি গাইলাম, দেলাম, নেলাম ইত্যাদি।

৬। চলিত শিষ্ট বাংলায় যেটা ঘটমান বর্তমান দক্ষিণ বঙ্গীভাষায় সেটা পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি হরছি (আমি করেছি)।

৭। মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হয় 'বা'। যেমন—তুমি যাবা না?

৮। উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল 'মু'। শিষ্ট বাংলার 'ইব' দক্ষিণ বঙ্গীভাষায় 'মু' হয়। যেমন—করিব>হোরমু, ধরিব>ধোরমু, খাইব>খামু, যাইব>যামু, লইব>লোমু ইত্যাদি।

৯। উত্তম পুরুষের এক বচনের সর্বনাম হল—'মুই'।

১০। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল 'থাইক্কা'। যেমন—মায়ের থাইক্কা মাসির দরদ।

১১। 'আমাদের, আমরা', দক্ষিণ বঙ্গীভাষায়—'মোগো', 'মোরা'।

১২। 'ঙ' ধ্বনি শব্দের আদিতে বসেনা, মধ্যে ও অন্তে বসে। রঙের, রঙ।

১৩। দক্ষিণ বঙ্গীভাষায় সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও রংপুরের ন্যায় দুর্বোধ্য নয় বরং চলিত বাংলার ধ্বনি ও ব্যাকরণগত সাযুজ্যের জন্য অনেকাংশে সহজবোধ্য।

১৪। ক্রিয়াপদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—রাঢ়িতে যেটা সাধারণ বর্তমান রূপ, দক্ষিণ বঙ্গীভাষায় সেটা ঘটমান বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মায় বোলায় (অর্থাৎ মা ডাকছে)।

১৫। অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়া সম্পন্নকালে মূল ক্রিয়াটি আগে বসে। অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন—বাবায় আডে গ্যাছেইগ্যা (বাবা হাটে চলে গেছে)।

১৭। করণ—অনুসর্গ রূপে 'সাতে' ও 'লগে' শব্দের ব্যবহার।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য উপভাষা থেকে বরিশালের উপভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক না হলেও বাঙালি উপভাষার শাখাভুক্ত একটি স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে গণ্য করা যায়। খুব স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য উপভাষা যেমন কামরূপি বা রাজবংশি, বরেন্দ্রি ইত্যাদি উপভাষা থেকে বরিশালের উপভাষা সম্পূর্ণ পৃথক একটি উপভাষা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য উপভাষার সঙ্গে বরিশালের উপভাষার সাদৃশ্য আছে এ সাদৃশ্য সব উপভাষার মধ্যে কমবেশি আছে। কেন না সবগুলো উপভাষা এক বা অভিন্ন বাংলা ভাষারই আঞ্চলিক রূপ মাত্র।

উল্লেখ্যপঞ্জি :

১. আলী, মোহাম্মদ ইদরিস। ১৩৮৬। আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ। বাংলা একাডেমী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র।
২. আহমদ, ওয়াকিল। ১৯৮৮—বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া। বাংলা একাডেমী : ঢাকা। —

১৯৯৪। বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন, বাংলা একাডেমী : ঢাকা। —১৯৯৫, বাংলা লোকসাহিত্য ধাঁ ধাঁ। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

৩. ইসলাম, পি.এম. সফিকুল। ১৯৯২। রাজশাহীর উপভাষা। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪০২। বাংলা শব্দতত্ত্ব, বিশ্বভারতী : কলকাতা।

৫. দাস, নির্মলকুমার, ১৯৭০। উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৯৭৯, উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা।

৬. নাথ, মৃণাল ১৯৯৯। ভাষা ও সমাজ। নয়া উদ্যোগ : কলকাতা।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদনা)। ১৯১৯। আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান, প্রথম খণ্ড। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলকাতা।

৮. ভূঁইয়া, সুলতান আহমদ। ১৩৬৩। বরিশাল জেলার কথ্য ভাষা। আজাদ, পৌষ ২২।

৯. মজুমদার, অতীন্দ্র। ১৯৯৭। ভাষাতত্ত্ব। নয়া প্রকাশ : কলকাতা।

১০. মজুমদার, পরেশচন্দ্র। ১৯৯২। বাংলা ভাষা পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

১১. মনির, শাহজাহান, ১৩৮৭। ধ্বনি ও ধ্বনিমূল বৈশিষ্ট্য বাংলা ও ইংরেজি—ধ্বনিমূলের সম্পর্ক। বাংলা একাডেমী পত্রিকা : পঞ্চবিংশ বর্ষ : বৈশাখ-আশ্বিন।

১২. মনিরুজ্জামান। ১৯৯৪। উপভাষা চর্চার ভূমিকা। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

১৩. মাসুদ, মুস্তাফা। ১৩৯২। যশোর জেলার লোকসাহিত্য : প্রবাদ-প্রবচন। সাহিত্য পত্রিকা : অষ্টবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, পৃ. ২৭-৮০।

১৪. মুসা, মনসুর। ১৯৯৬। ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী : ঢাকা। ১৩৮৭। ধ্বনিমূল বিচার। বাংলা একাডেমী পত্রিকা : পঞ্চবিংশ বর্ষ : বৈশাখ-আশ্বিন, পৃ. ১৫৬-৬৭ : ঢাকা।

১৫. মোমতাজী, মুহম্মদ সিকান্দার। ১৩৭৪। বরিশালের ছড়া। সুলভ পত্রিকা : বরিশাল।

১৬. মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। ১৯৯৪। বাঙ্গালীর উপভাষা চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। মনসুর মুসা সম্পাদিত বাঙ্গালীর বাংলা ভাষা চিন্তা। এশিয়াটিক সোসাইটি : ঢাকা।

১৭. ১৯৯৭। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। নয়া উদ্যোগ : কলকাতা।

১৮. লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন। ১৩৬৮, সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

১৯. শ', রামেশ্বর, ১৪০৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

২০. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। ১৯৯১। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স : ঢাকা। ১৯৯৩, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

২১. শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ। ১৯৯৮। ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা।

২২. সরকার, পবিত্র। ১৩৯৮, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি। কলকাতা।

২৩. সেন, সুকুমার। ১৯৯৫, ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা।

২৪. হাই, মুহম্মদ আবদুল। ১৩৮৮। ঢাকাই উপভাষা। সাহিত্য পত্রিকা : পঞ্চবিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা শীত, পৃ. ২৪৫-২৫৫।
১৯৯৮, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। মল্লিক ব্রাদার্স : ঢাকা।

২৫. হুমায়ুন, রাজীব, ১৯৯৩। সমাজভাষাবিজ্ঞান, বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব-চর্চা পরিষদ এবং দ্বীপ প্রকাশন : ঢাকা।